Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 82–90
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

অন্নদামঙ্গলের শিব : এক বিবর্তিত চরিত্র

নাজনিন পারভিন
গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: nazninpervin@gmail.com

Keyword
শিব, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, উমার দাম্পত্য, দুর্ভিক্ষ

Abstract
বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে শিব একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বৈদিক যুগের সকল সাহিত্যে আমরা শিবকে রুদ্ররূপে লক্ষ্য করি। বেদ পরবর্তী পৌরাণিক যুগে শিবের চরিত্রে আমরা খানিকটা পরিবর্তন দেখেছি। এখানে শিব চরিত্রে রুদ্ররূপ ও যোগীরূপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। আর প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে রুদ্র, যোগীরূপের আবরণ খুলে শিব চরিত্রের মানবায়ন ঘটেছে। 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের দেবখন্ডে ঘর-গৃহস্থালী বর্ণনা পাওয়া যায়, এই গার্হস্থ্য জীবনে রয়েছে হাসি কান্না। 'শিবায়ন' কাব্যে আমরা শিবকে কৃষক হিসেবে দেখি। সবথেকে করুণ পরিণতি ঘটেছে অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। কাব্যের মধ্যে শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনির পাশাপাশি শিব-গৌরীর সংসারযাত্রার লৌকিক কাহিনি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। যুগের চাহিদাকে মাথায় রেখে শিবকে কবি কৈলাস পর্বত থেকে নামিয়ে এনেছেন ধূলিধূসরিত পরিবেশে। কুলীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে বেরোতে হয়েছে অন্নের আশায়। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে যেমন শিবকে উপস্থাপিত করেছেন অন্যদিকে অঙ্কন করেছেন সেই যুগের যৌনাকাঙ্ক্ষায় মশগুল লাম্পট্য চরিত্রের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রূপে। দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যমূলক কাব্য হলেও এটি আসলে অন্নদাতার মাহাত্ম্যমূলক কাব্য, যাতে সারাজীবন অন্নভাব না ঘটে। তার জন্য অন্নদাতা দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। পরিবর্তনশীল যুগের সঙ্গে দেবতাদেরও পরিবর্তন ঘটে। তাই সৃষ্টিকর্তা শিব পরিবর্তিত হয়েছেন ভিখারি শিবে। তাই আমরা বলতে পারি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের শিব পৌরাণিক চরিত্রের এক বিবর্তিত রূপ।

Discussion
'শিব' উচ্চারণ এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে প্রলয়কারী, ধ্বংসকারী এক রুদ্ররূপ। এই রুদ্ররূপী শিব ছিলেন বৈদিক যুগের। ঋকবেদের রুদ্র যজুর্বেদে এসে মঙ্গলময় দেবতায় পরিণত হয়েছে। যুগ প্রয়োজনে আমরা দেবতাকে আমাদের মতো করে গড়ে তুলেছি, এটা শুধুমাত্র যে শিব চরিত্রের ক্ষেত্রে ঘটেছে তা কিন্তু নয়। সমস্ত দেব-দেবীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি। তবে এই বিবর্তন আমরা বেশি করে লক্ষ্য করেছি শিব চরিত্রের মধ্যে। যে শিবকে বেদে ধ্বংসকারী রূপে দেখতে পাই সেই শিবকে পুরাণে দেখেছি মঙ্গলকারী, জরা-ব্যাধী দূরকারী রূপে। বেদ পুরাণ ছাড়াও

প্রাগাধুনিক প্রায় সকল বাংলা সাহিত্যে শিবের উল্লেখ পাই। প্রাক আধুনিক যুগের একটি বড় অংশ হলো মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যে শিব বেদ-পুরাণের শিব নয়। এই শিব একেবারে আমাদের লোকায়ত জীবনের শিব। মঙ্গলকাব্যের কবিরা শিবের পৌরাণিকতাকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দেননি ঠিকই কিন্তু বেশি করে ফুটিয়েছেন শিবের মানবিক বৈশিষ্ট্য। এই শিবের মধ্যে অনেকেই আর্য-অনার্যের এক মিশ্রণ দেখেছেন। 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' অপেক্ষা 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে আমরা পৌরাণিক শিবকে যতটা না দেখতে পাই তার থেকে বেশি লৌকিক শিবকে দেখতে পাই। শিব চরিত্রের এরকম বিবর্তন ঘটেছে যুগের তাগিদে।

মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল সেই সময়ে যখন সেন যুগের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের পথ খুঁজছিল আর এই রকম পরিস্থিতিতে বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে তখন একটু ভালো করে বাঁচার আশায় সেন রাজাদের অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসে দলে দলে নিম্নবর্ণের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকলে সমাজের উচ্চস্থানে বসে থাকা হিন্দু সমাজের মানুষ নিজেদের সংকটজনক অবস্থা বুঝতে পারে। নিজেদের ধর্মকে বাঁচানোর জন্য পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার সমন্বয় সাধন করে হিন্দুধর্মকে নতুন রূপে গড়ে তুলেছিল মঙ্গলকাব্যের (বিশেষত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল) মধ্য দিয়ে। সে দিক থেকে ব্যতিক্রম নয় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। যুগের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েই ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্য যখন রচিত হয়েছিল তখন বাংলাদেশের অবস্থা ছিল অরাজকতাময়। ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর ফলে মোঘল সাম্রাজ্যের ফাটল ধরতে শুরু করে আর এই সুযোগে মারাঠা শক্তির জাগরণ হয়। আলমগীর বাদশার মৃত্যুর পরে এই মারাঠা শক্তি প্রবলতর হতে থাকে। আহমদ শাহ আবদালির নেতৃত্বে বার বার (১৭৪৮-১৭৬৪) ভারত আক্রমণের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই রকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পায়নি বঙ্গজননী। ১৭১৩ সালে বাংলা সুবেদার পদে নিযুক্ত হন মুর্শিদকুলি খাঁ। এরপর ক্রমশ বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল ও দশ বছর একটানা মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ এবং আফগানদের দুবার আক্রমণের মোকাবেলা করতে গিয়ে বাংলার অর্থ ভান্ডার ক্রমশ নিঃশেষিত হতে শুরু করার ফলে আলীবর্দি বাংলাকে রক্ষার তাগিদে জমিদার, ইংরেজসহ অন্যান্য বণিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করে, যার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের ওপর। আর শান্তিপূর্ণ সমঝোতায় আসে মারাঠাদের সঙ্গে, কিন্তু তাসত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি আত্মীয় ও কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে। এই রকম পরিস্থিতিতে ভারতচন্দ্র রচনা করেছিলেন তাঁর কালজয়ী কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'।

সাহিত্য দেশ-কালকে অতিক্রম করে রচিত হতে পারেনা। সাহিত্যিক দেশ-কালকে বহন করেন তাঁর সাহিত্যের মধ্যে। সেই দিক থেকে ব্যতিক্রমী নন ভারতচন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কবি দেখেছিলেন এক বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিস্থিতি। একদিকে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যখন বিশৃঙ্খলিত সেই সময়ে নবাব ও ধনীবণিকদের বিলাসবহুল জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কামনা সর্বস্ব ভোগবাদী সংস্কৃতির। সেই দিক থেকে বাদ পড়েনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা। সেই রাজসভার কবি হয়ে ভারতচন্দ্র রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন আদি রসের। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে পাশবিক অত্যাচার করে রাজস্ব আদায়, বর্গীদের লুণ্ঠন ইত্যাদির ফলে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। আর এই রকম পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ চেয়েছিল তাদের প্রাণের দেবতাদেরকে নিজেদের মতো করে পেতে। এইজন্য ভারতচন্দ্র যুগের চাওয়া-পাওয়াকে মর্যাদা দিয়ে দেবতাদের পৌরাণিক মহিমাকে ত্যাগ করে দেবতাদের তৈরি করলেন বুভুক্ষু সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে। দেবাদিদেব মহাদেব তাই আর কৈলাস পর্বতে বসে ধ্যানাসনে মনোযোগ স্থাপন করতে পারলেন না, নেমে এলেন ধূলিধূসরিত পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করতে। এই পৌরাণিক শিবের বিবর্তন ঘটিয়ে তিনি দুই শ্রেণীর মানুষের চাহিদা তুলে ধরলেন শিবের মধ্যে। একদিকে রাজসভার যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য ধনিক সম্প্রদায়ের যৌনলালসাকে তুলে ধরলেন আর অন্যদিকে অসহায়, নিরন্ন মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে শিবের হাতে ধরালেন ভিক্ষার পাত্র। এই শিব অষ্টাদশ শতাব্দীর এক মিশ্র সংস্কৃতি।

তিন খন্ডে রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের (প্রথম খন্ড- অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খন্ড- বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল, তৃতীয় খন্ড- মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল) প্রথম খন্ডে আমরা শিবকে পেয়ে থাকি। শিবের পৌরাণিক চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন মহাভাগবত পুরাণের। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো তিনি শিব চরিত্রে পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করলেও এই বৈশিষ্ট্য ভারতচন্দ্রের হাতে ক্রমশ ক্ষীণ হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দী যুগ পরিবেশের কারণে। পুরাণ অনুসারে রাজা দক্ষের কন্যা সতীর সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের বিয়ে হয় নারদের মিথ্যা ভাষণের চক্রান্তে। কিন্তু এ বিয়ে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি দক্ষ, তাই সর্বদা শিবের নিন্দা করেন। শিব শ্বশুরের আচরণে বিরূপ হয়ে বিয়ের দিনে কৈলাসে গমন করেন-

"নারদ ঘটক হয়ে নানামত বলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিলা সতী।
শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈলা বামমতি।।
সদাশিব নিন্দা করে মহা ক্রোধ হৈল হরে
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে।" [১]

এরপরে আমরা দক্ষকে যজ্ঞের আয়োজন করতে দেখি, যেখানে শিবকে আমন্ত্রিত করা হয়নি। কিন্তু সতী বিনা আমন্ত্রণে যজ্ঞে সামিল হতে চাইলে শিব যেতে বারণ করেন। শিবের সামনে সতী দশমহাবিদ্যা রূপে প্রকট হলে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। তারপর দক্ষগৃহে শিব নিন্দায় সতীর প্রাণ ত্যাগ, দক্ষের যজ্ঞ পন্ড, দক্ষের মৃত্যু, প্রসূতির প্রার্থনায় দক্ষের পুনরায় জীবন লাভ, সতীর অভিশাপে দক্ষের ছাগমুন্ড হওয়া, প্রাণ ফিরে পেয়ে দক্ষের শিব বন্দনা, সতীর দেহ কাঁধে শিবের পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং বিষ্ণু কর্তৃক সতীর দেহকে ৫১ টি খন্ডে বিভাজন এবং সেই সমস্ত স্থানে সতীপীঠ গড়ে ওঠার কাহিনি- এসবই পুরাণ (মহাভাগবত) অনুসারে সাজিয়েছেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু সতীর দেহত্যাগের পর পুরাণে যে মহাপ্রলয়কারী নটরাজকে আমরা তান্ডবলীলা করতে দেখি, সেই তান্ডবকারী শিব অপেক্ষা ভারতচন্দ্র পত্নীপ্রেমিক এক স্বামীকে অঙ্কন করেছেন। সতীর মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব শোকাকুল হয়ে পড়েছেন–

"শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন।" [২]

যজ্ঞস্থানে সতীর মৃতদেহ দেখে শিবের দুঃখ আর দ্বিগুণ বেড়ে গেছে তাই নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি শিব–

"যজ্ঞ স্থানে সতীদেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর।।" [৩]

শিবের এই রকম করুণ পরিস্থিতি দেখে মহাকালের ভয়ঙ্কর মূর্তি দূরে সরে গিয়ে বাঙালির মনে জায়গা করে নিয়েছে স্ত্রীর বিরহে বিরহী এক প্রেমিক সত্তা।

স্ত্রীর বিরহে শিব একাকি ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। পুরাণ ও কুমারসম্ভব অনুযায়ী কবি শিবকে ধ্যানে বসালেন। মদনের বাণ নিক্ষেপের ফলে ধ্যানভঙ্গ শিবের অভিশাপে মদন ভস্মীভূত হন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের মধ্যে কোন চঞ্চলতা লক্ষ্য করা যায় না। ভারতচন্দ্র ধ্যানভঙ্গ শিবকে অঙ্কন করেছেন বিচলিত কামোন্মত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর যৌনলোলুপ ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে। আমরা আগেই বলেছি ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার কবি রাজ-অমাত্যদেরকে আমোদ দেওয়ার জন্যই শিবকে তাদের রুচি অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন—

"মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে ।।
কামে মত্ত হর দেখিয়া অন্তর।

কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পালাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল।।" [৪]

এই শিবকে দেখে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, এই শিব কোনো পৌরাণিক বা কুমারসম্ভবের শিব নয়, এ হল অষ্টাদশ শতাব্দীর ধনিক সম্প্রদায়ের কামুক প্রবৃত্তির মানুষ, যার কামনা চরিতার্থ করার জন্য নারীর উদ্দেশ্যে গমন করেছেন আবার নারীর সন্ধান না পেয়ে বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করেছেন। ভারতচন্দ্র রাজসভায় বসে তাদের উন্মত্ত, উশৃঙ্খল, কামনালোলুপ চিত্র তুলে ধরেছেন তাদেরই সম্মুখে, শিব চরিত্রের রূপকের আড়ালে। এই আড়াল আবডালকে তারা বুঝতে না পেরে শিবের কামোন্মত্ততাকে আস্বাদন করেছে। তাদের সামনে তাদেরই চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পেরেছেন কেবলমাত্র তাঁর অভাবনীয় প্রতিভার গুণে যা তারা ঘুনাক্ষরেও উপলব্ধি করতে পারেনি। এই প্রতিভার অভাবে ঘটতে পারত পূর্বনির্ধারিত অভাব-অনটনসহ কষ্টসাধ্য জীবনযাপন– এর পরিবর্তে তিনি লাভ করেছেন রাজসিক জীবনযাপন এবং রায়গুণাকরের মতো উপাধি।

পুরাণ ও কুমারসম্ভবে উল্লিখিত হয়েছে যে মদনভস্মের পর শিব পুনরায় ধ্যানে বসেছেন। আর অন্যদিকে ধ্যানে বসেছেন পার্বতী শিবকে পাওয়ার আশায়। পার্বতীর ধ্যানে তুষ্ট হয়ে শিব-পার্বতীর মিলন হয়েছে এবং এই মিলনের পেছনে রয়েছে পৃথিবীকে তারকাসুরের হাত থেকে রক্ষা করার মতো মহৎ উদ্দেশ্য। এই মিলন উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> *"সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্য কুমার জন্মরূপ মহৎব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শর নিক্ষেপ করিয়া ধৈর্যবাঁধ ভাঙ্গিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে, সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না।"* [৫]

শিবের এই কামুকতার ছবি ভারতচন্দ্রের একেবারে নিজস্ব সৃষ্টি। তাঁর কামুকতার চিত্র আমরা পাই পদ্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বামনপুরাণের মতো রচনায়। পদ্মপূরাণে উল্লেখিত হয়েছে—

"পুরা শর্বঃ স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা যুবতীরূপশালিনী।
গন্ধর্বকিন্নরানাঞ্চ মনুষ্যানাঞ্চ সর্বতঃ।।
মন্ত্রেণ তা সমাকৃষ্য ত্বতিদূরে বিহায়সি।
তপোব্যজপরো দেবস্তাসুসঙ্গত মানসঃ।।" [৬]

পুরাণে শিবের কামুকতার যে সামান্যতম উল্লেখ আছে তাকে পূর্ণতা দান করেছেন ভারতচন্দ্র। সময়ের উপযোগী করে তাঁকে সেই সময়ের মানব চরিত্রে পরিণত করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই নারদ যখন শিবের বিবাহ প্রস্তাব এনেছেন উমার সঙ্গে তখন শিব তাকে বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলে। কিন্তু নারদ তাঁকে সান্ত্বনা দেয় এই বলে—

"প্রায় হয়ে বুড়া ভুলিয়াছ খুড়া
দিন দুই স্থির রহ।" [৭]

শিব বিয়ে পাগলা বুড়োতে পরিণত হয়েছে। এই কামোন্মত্তার সঙ্গে সঙ্গে কবি শিবের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের সামাজিক এক কুপ্রথা কৌলিন্য প্রথাকেও চিহ্নিত করেছে—

> *"অষ্টাদশ শতকে যখন দেবভক্তি ক্ষীয়মান, তখন ভারতচন্দ্র যুগসচেতন কবির মত দেবতার প্রতি সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। যে শিব স্বয়ং চিৎশক্তির আধার ভারতচন্দ্র তাঁকে মর্ত্যের ধূলিধূসরিত চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। শুধু তাই নয়, তার চরিত্রে আরোপ করেছেন কুলীন ব্রাহ্মণের চরিত্র- যে কামোন্মত্ত, হতদরিদ্র ও শিথিল সংস্কৃতির প্রতিভূ।"* [৮]

সেই সময় মেয়েদের সঠিক সময়ে বিয়ে দিতে না পারলে একঘরে হওয়ার ভয় কন্যার পিতা-মাতাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করত। সেই দিক থেকে ব্যতিক্রম নয় হিমালয়-মেনকা। তাই না দেখেই নারদের মুখের কথা শুনেই শিবের সঙ্গে উমার বিবাহ দিতে রাজি হয়ে যায়। হিমালয় ও মেনকার মধ্যে তৎকালীন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতার ছবিই আমরা দেখতে পাই। কুলীন বর পেলে কোনো কিছু চিন্তা না করে তড়িঘড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা হত।

> *"মধ্যযুগীয় যে ভক্তিভাবনা দৈববিশ্বাসকে অবলম্বন করে একদিকে চৈতন্য সংস্কৃতি ও অপরদিকে মঙ্গল দেবদেবীর উপাসনাকে আশ্রয় করে প্রবাহমান হয়ে চলেছিলো ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত অষ্টাদশ শতকে এসে যেন সেই ভক্তি দৈববিশ্বাসে লাগলো সংশয়ের আঘাত।"* [৯]

এই সময়ে দেবতার প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছিল না সাধারণ মানুষ তাই ভারতচন্দ্র শিব চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন, তা যুগের চাহিদাকেই স্পষ্ট করে তোলে *"হাস্য পরিহাসের অন্তরালে অবসিত মধ্যযুগের ক্লান্ত ভক্তির দীর্ঘশ্বাস; এবং দেবতার অলৌকিক শক্তির প্রভূত নিদর্শন সত্ত্বেও, শিথিল ভক্তির পটভূমিকায় জাগতিক মানুষেরই উদ্যম ও বিপর্যয়ের কাহিনী।"* [১০] 'শিবের বিবাহ যাত্রা' ও 'শিব বিবাহ' অংশে যে শিবকে আমরা পাই তাতে পৌরাণিক গুনের বিসর্জন দিয়ে রঙ্গ-ব্যাঙ্গের পাত্র হয়ে উঠেছে, খোরাক জুগিয়েছে আমোদ-প্রমোদের।

বুড়ো শিব বলদে চেপে শিঙ্গা ফুকতে ফুকতে বিয়ে করতে এলে হতবাক হয়েছে কন্যার বাড়ির লোকজন। এরপর আমরা দেখি বিষ্ণুর চক্রান্তে শিবের কোমরবন্ধনী হিসাবে থাকা সাপকে গরুড় যখন ভয় দেখিয়েছে তখন শিবের কোমরে থাকা বাঘছাল খসে পড়লে শিব উলঙ্গ হয়ে পড়ে মেনকার সামনে—

"বাঁঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈল হর।
এয়োগন বলে ও মা এ কেমন বর।।
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা।।" [১১]

শুধুমাত্র হাস্যরস বা রাজ-অমাত্যদের আমোদ দেওয়ার জন্য শিবকে উলঙ্গ করলেন? উলঙ্গ শিবের চিত্র শুধুমাত্র হাস্যরসের উদ্রেক ঘটায়নি বরং সেই সময়ের উলঙ্গ চিত্রটিকে তুলে ধরেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিজাত সম্প্রদায়েরা যারা কামনায় মত্ত ছিলো, ডুবে ছিলো যৌনতার পঙ্কিলতায়। সেই সম্প্রদায়ের নগ্নতাকে তুলে ধরেছেন। এই নগ্নতার প্রতি মেনকার মতো সাধারণ মানুষ যেন প্রদীপ নিভিয়ে এবং ঘোমটা টেনে প্রতিবাদ জানাতে চায়। চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে এইরকম কুরুচিপূর্ণ দৃশ্যকে আড়াল করতে চায় সেই সময়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে চাওয়া সাধারণ মানুষজন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার কোনো মূল্য থাকেনা, তাই দৃশ্যটির বিস্তারিত রূপ দেখি-

"শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়।।" [১২]

যুবতী গৌরীর স্বামী হিসেবে বৃদ্ধ শিব একেবারে বাস্তব সম্মত হয়ে উঠেছে। বিয়ের আগে মেয়ের বরকে বাবা-মা দেখেননি ঠিকই কিন্তু দেখলেও এর কোনো হেরফের হতো না। কন্যার পিতা-মাতার কাছে পছন্দ মতো বর নির্বাচন করার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ মেয়েদের সুযোগ্য বর নির্বাচন করা অপেক্ষা নিজেদের কূল বাঁচানো বেশি জরুরি ছিল তাই মেয়েদেরকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে অনুতাপ করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। বর দেখে হিমালয়ের হতবুদ্ধি হওয়া ব্যতীত আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পায় না কারণ তিনি জানেন এটাই ভবিতব্য। কিন্তু মায়ের মন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, আর সমস্ত কিছুর জন্য নারদকে দায়ী করেছেন-

"ওরে বুড়া আটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে।।" [১৩]

সোনার পুতুলের মতো মেয়ে উমার পরিণতির কথা ভেবে মায়ের মুখ থেকে এরকম কথা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। সেই সময়ে কন্যাদায়গ্রস্থ মায়েদের পরিস্থিতি কেমন ছিল কবি মেনকার মধ্য দিয়ে তা বাস্তব সম্মত করে তুলেছেন।

এরপর আমরা দেখতে পাই শিব-উমার দাম্পত্য জীবনের কাহিনি। পুরাণে হর-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনকে একটা আদর্শ রূপে গড়ে তুললেও ভারতচন্দ্র সেই আদর্শচ্যুত হয়ে মানবিক রূপদান করেছেন। সতীকে উমা রূপে ফিরে পেয়ে তাঁর বিরহ ব্যাথা দূর হয়েছে, জেগে উঠেছে প্রেমিক সত্তা। প্রেমিকা উমার কাছে যেন তাঁকে ছেড়ে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে চান *"সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর।"*[১৪] মহাপ্রতাপকারী দৈবসত্তার পরিবর্তে বারবার করে বেরিয়ে এসেছে শিবের প্রেমিক রূপটি, সতী ছাড়া শিব যেন মনি হারা ফনী। তাই উমা রূপে সতীকে পেয়ে তার জীবন পুনঃরায় সার্থক হয়েছে। তাঁর এই আনন্দময় জীবনে পুনঃরায় নিরাশার আলো দেখতে চাননা, তাই নিজের দেহের সঙ্গে পার্বতীর দেহ মেলাতে চান– *"হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকে রঙ্গে।"*[১৫] যদিও হরগৌরীর এক হওয়ার ভাবনাটা এসেছে পুরাণের অর্ধনারীশ্বরের ধারণা থেকে। তন্ত্রে-পুরাণে অর্ধনারীশ্বরের বৈচিত্র্যময় বর্ণনা পাওয়া যায়। 'পদ্মপুরাণে' দেখতে পাই সাবিত্রী হরপার্বতীকে একদেহ হওয়ার বর দিয়েছিলেন–

"শরীরার্ধে চ তে গৌরী সদা স্থাস্যতি শংকর।
অনয়া শোভসে দেব ত্বয়া ত্রৈলোক্যসুন্দর।।"[১৬]

পুরাণের তত্ত্বকথায় না গিয়ে ভারতচন্দ্র শিব-পার্বতীর এক হওয়ার মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের পূর্ণতা ও গভীরতাকে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি জানতেন সেই সময়ে মানুষ তত্ত্বকথাকে গ্রহণ করবেনা। তাই একেবারে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্ধনারীশ্বরের ভাবনাটি দেখাতে চেয়েছেন। প্রেমের পূর্ণতা স্বরূপ জন্ম হয়েছে কার্তিক,গণেশের। এদের জন্মের পেছনে কোন তত্ত্বকথা নয় বরং তাদের জন্ম হয়েছে প্রেমের আকুতি থেকেই—

"দুই জনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে।।
এই রূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইল কুমার।।"[১৭]

এই প্রেম কলহে পরিণত হয় যখন শিব দিন যাপনের জন্য সামান্য অন্নটুকুও জোগাতে পারেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে *"মারাঠা আক্রমণের ফলে দেশের কৃষি ব্যাবস্থা এমন ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলো যে দরিদ্র মানুষের সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে প্রাণপাত করতে হয়। ফলে আর্থিক শ্রেণীগত বিভেদ আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিলো তখন। হতভাগ্য দরিদ্র সাধারণের লাঞ্ছনার শেষ ছিলো না। মুর্শিদাবাদের শাসন যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ও নিপীড়ন অপেক্ষা শোষণ ও নির্যাতন যে কম ছিলো এমন নয়। তার উপর ছিল দস্যুতস্করের উৎপাত। পর্তুগীজ জলদস্যু আক্রমণ, মর্মান্তিক দাস ব্যবসায় অতি নগণ্য মূল্যে বালিকাবিক্রয় ইত্যাদি। দারিদ্র্যের জ্বালা যে ভয়ানক হয়েছিলো, এরূপ অসংখ্য ঘটনাই তার প্রমাণ। অন্নের অভাব তাই ভারতচন্দ্রের কেবল শুদ্ধকল্পনা নয়, তা সেকালের একটি বাস্তব সত্যও বটে।"*[১৮]

রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের প্রাথমিক জীবন নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। অন্নভাব কাকে বলে তা তিনি নিজে উপলব্ধি করেছেন। যে দিন খাবার জুটেছে সেদিন খেয়েছেন আর যেদিন জোটেনি সেদিন খালি পেটে থেকেছেন। অন্নভাবে জীবন কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যের চরিত্রের মধ্যে। বিশেষ করে শিবের মধ্যে। সাধারণ মানুষ শিবের মধ্যে নিজেদেরকে একাত্ম করেছিলো। পৌরাণিক অন্যান্য আর্য দেবতার থেকে শিবের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে দেখি। এর জন্যই দক্ষের যজ্ঞে তাঁর স্থান মেলে না। ভারতচন্দ্রের কাব্যে শিব মিশে গেলেন খেতে না পাওয়া দরিদ্র মানুষের সঙ্গে।

শিব কুলীন, কুলীনদের উপার্জনের কথা চিন্তা করতে হতো না। কুলীনদের একাধিক স্ত্রী থাকায় স্ত্রীদের বাপের বাড়ি গিয়ে কিছুদিন সুখে দিন কাটিয়ে, অর্থ সংগ্রহ করেই বছর কেটে যেতো। কিন্তু সময় বদলেছে কুলীনদেরও সংসারে অন্নভাব দেখা দিয়েছে, বেরোতে হয়েছে উপার্জনে ভীক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে। অন্ন বাঙালির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাণ ধারণের জন্য প্রাথমিক চাহিদাটুকু যখন শিব পূরণ করতে পারেননা বরং এই অভাব অনটনের জন্য স্ত্রী পার্বতীকে দায়ী করেছে অন্যান্য তৎকালীন পুরুষদের মতো তখন পার্বতীও পুরুষ সমাজকে বুঝিয়ে দিয়েছেন স্ত্রীর ওপর সমস্ত কিছু দায় চাপানো যায় না। স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছে—

"আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।

উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন।।
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয় ।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়।।" [১৯]

অভাবের তাড়নায় সকলেই তিক্ত হয়ে উঠেছে। যেখানে সমস্ত কিছু বেদনাদায়ক। স্বামী স্ত্রীর কাছে বারবার তিরস্কৃত হয়েছে। সেখানে ঘরে থাকার থেকে ভিক্ষাবৃত্তিকেই শ্রেয় বলে মনে হয়েছে—

"ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্ত্ররা সে যেন জীয়ন্তে মরা
তাহার উচিত বনবাস।।" [২০]

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত আমরা কুলীনদের বসে বসে খেতে দেখেছি। 'শিবায়ন' কাব্যে আমরা শিবকে চাষবাস করতে দেখি। ভারতচন্দ্রের শিব বৃদ্ধ হওয়ার কারণে চাষবাস, বাণিজ্য করার শক্তিটুকু তাঁর নেই। তাই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরের অবস্থাও খারাপ হয়েছে। ভিক্ষায় বেরোনোর আগে এক করুন অবস্থাপন্ন শিবকে আমরা পাই-

"বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে।।" [২১]

কিন্তু কোন উপায় নেই শরীরকে টিকিয়ে রাখতে ভিক্ষায় বেরোতেই হয়। সংসারের নিত্য দারিদ্র্যের মধ্যে এক পুত্র নেশা করে বেড়ায় অন্যজন বাবুগিরিতে ব্যস্ত—

"বড়পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুন সিদ্ধি খেতে বাপের সমান।।
— -- --
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায় ।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়।" [২২]

এ যেন উনিশ শতকের বাবু সমাজের চিত্রের পূর্বাভাস দিয়েছেন ভারতচন্দ্র। পারিবারিক কলহ ছিল নিত্য সঙ্গী ফলে শিব ঠাকুর সংসার ত্যাগ করে গেলে পার্বতীও সন্তানদের নিয়ে পিতৃগৃহে যেতে উদ্যত হয়, কিন্তু পিতৃগৃহে স্বামী পরিত্যাক্ত রমনীর সম্মান নাই, তাই সখী জয়ার উপদেশে নিজ রূপে আত্মপ্রকাশের কথা বলে, তাই অন্নপূর্ণার রূপ ধারণ করে ত্রিজগতের অন্নহরণ করেন। ভারতচন্দ্র পৌরাণিক আভাসে দেবীর এই রূপটিকে দেখালেও অনেকেই দেবীর মধ্যে অত্যাচারী নবাব ও ধনপতিদের চিত্র দেখেছেন। এই দিক ছাড়াও এই চরিত্রের মধ্যে কুলীন গৃহকর্ত্রীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন কবি।

কবি দেখিয়েছেন দেবী অন্নদার কারণে অন্নাভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এই অন্নভাব আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘরে ঘরে। ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কনের 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে শিব ভিক্ষায় বেরোলে নিজেদের সাধ্য মতো শিবের হাতে ভক্তি ভরে অন্ন তুলে দিয়েছে সকলে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষ আর দেবতার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না, নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অন্যদেরকে অন্ন দেওয়া তো দূরের কথা নিজেদের অন্নসংস্থান করতে পারছে না। তাই যেখানেই অন্নের জন্য গেছে সেখানেই খালি হাতে ফিরেছে—

"কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া ।।
আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিখারী।
কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পারি।
এই রূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর।।" [২৩]

মুকুন্দরাম 'চন্ডীমঙ্গলে' ভিখারি শিবকে কোচরমণীদের পুরাতন নাগর রূপে এঁকেছেন, রামেশ্বর তাঁর কাব্যে ভিক্ষার জন্য শিবকে মনোহর বেশে কোচের নগরে প্রবেশ করিয়েছেন । সবথেকে করুণ পরিণতি দেখা গেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে, বালক গনের কাছে শিব ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্র হয়েছেন—

"কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।।"[২৪]

শিবের ঐশ্বরিক মহিমা একেবারে ধূলোয় লুণ্ঠিত হয়েছে। এই শিবকে দেখে আমাদের করুণা হয়। এই করুণ চিত্রটি অঙ্কন করেছেন সেই সময়ে খেটে খাওয়া মানুষদের না খেতে পাওয়ার ফলে যে কী ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেই দিকটি চিহ্নিত করেছে শিবের মধ্য দিয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অসহায়তার ভাষা ছিল *"ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার।"*[২৫] আর স্বপ্ন ছিল *"সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই।"* [২৬] এই স্বপ্ন পূরণ করেছে দেবী অন্নপূর্ণা অন্নদান করে—

"অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন।।" [২৭]

শিবকে অন্নদানের মধ্যে পৌরাণিক তত্ত্ব থাকলেও বড় হয়ে উঠেছে অনেকদিন খেতে না পাওয়া মানুষের চিত্র। শিব যেখানে গোগ্রাসে খেয়েছে তাতে কোনো দেবতার সংযতভাবে খাওয়ার দৃশ্য নয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি বুভুক্ষু সমাজের চিত্রই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে সেকালের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি শিবকে অন্নদান ও ঈশ্বরী পাটনীর অন্নপূর্ণার কাছে সন্তানদের 'দুধে-ভাতে' থাকার বর প্রার্থনা আসলে ঈশ্বরের কাছে আগামী দিনের সুস্থ পরিবেশের কামনা। আর এই অন্নের দেবী যাতে তাদেরকে ছেড়ে না যান তাই শিব নিজে উদ্যোগী হয়ে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে পুরী নির্মাণ করেছে। কারণ অন্নদাকে গুরুত্ব না দিলে পূর্বের মত তাঁকে ভীক্ষা করতে হবে। আসলে এই গুরুত্ব দেবী অন্নপূর্ণাকে নয় অন্নদাতাকে। অষ্টাদশ শতকে দেবতার প্রতি ভক্তি অপেক্ষা মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দিয়ে দেব-দেবীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। ঠিক একই চিত্র দেখা যায় ব্যাসদেবের ক্ষেত্রে —-

"অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে।
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে।।
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।" [২৮]

হরি-হরের তত্ত্ব অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে তৎকালীন চাহিদা। তাই ভক্তি অপেক্ষা ব্যাসদেব অন্নের সাহায্যে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে অন্নপূর্ণার ভক্তে পরিণত হয়েছে। যা যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব বলে মনে হয় পাঠকের কাছে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য যেন নতুন হয়ে উঠেছে ভাব-ভাবনা-ভাষা, চরিত্র-চিত্রন ইত্যাদি নানান দিক থেকে। এখানে শিব চরিত্রকেও যেন অঙ্কন করা হয়েছে নতুন ভাবে। শিব আমাদের কোনো লোকসমাজের চরিত্র নয়। এই চরিত্র হল পুরাণ, বেদ ও শাস্ত্রের দেব চরিত্র। কিন্তু এই শিবের বিবর্তন ঘটিয়ে ভারতচন্দ্র পরিণত করেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে। অন্যদিকে অঙ্কন করেছেন সেই যুগের যৌনাকাঙ্ক্ষায় মশগুল লাম্পট্য চরিত্রের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রূপে। এই দুই দিকই বেশি করে ফুটে উঠেছে পৌরাণিক মহিমা দূরে সরে গিয়ে। তাই আমরা বলতে পারি ভারতচন্দ্রের শিব পৌরাণিক চরিত্রের এক বিবর্তিত রূপ।

তথ্যসুত্র :

১. ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ-২২

২. ঐ, পৃ-৩১
৩. ঐ, পৃ-৩৭
৪. ঐ, পৃ-৪৭
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খন্ড, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১৫, পৃ-৭২০
৬. তর্করত্ন, পঞ্চানন অনুবাদিত: পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খন্ড (৫৬।১-৩), নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা ১৪১২, পৃ-৩০৪
৭. ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ-৪৮
৮. আচার্য, ড. দেবেশ কুমার, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য, সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা বইমেলা ২০১০, পৃ- ১৫৬
৯. মুখোপাধ্যায়, শ্রী নির্মলেন্দু (সম্পা.) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ-১৩ (ভূমিকা)
১০. ঐ, পৃ-১৭ (ভূমিকা)
১১. ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ-৫৭
১২. ঐ
১৩. ঐ, পৃ-৫৮
১৪. ঐ, পৃ-৬৮
১৫. ঐ
১৬. ভট্টাচার্য, ড. হংসনারায়ন, হিন্দুদের দেব-দেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পরিবর্তিত সংস্করণ-১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ-২০১৫, পৃ-৮৬
১৭. ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ-৬৯
১৮. মুখোপাধ্যায়, শ্রী নির্মলেন্দু (সম্পা.) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ-১০-১১ (ভূমিকা)
১৯. ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ-৭৫
২০. ঐ, পৃ-৭৭
২১. ঐ, পৃ-৭৮
২২. ঐ, পৃ-৭৬
২৩. ঐ, পৃ-৮৩
২৪. ঐ, পৃ-৮২-৮৩
২৫. ঐ, পৃ-৮৪
২৬. ঐ, পৃ-৭৪
২৭. ঐ, পৃ-৮৫
২৮. ঐ, পৃ-১৩৪